আলো পথ

এমএলই নিউজলেটার

দ্বাদশ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৬

এমএলই শিখন-শেখানো সামগ্রী চূড়ান্তকরণ কর্মশালার উদ্বোধন

'বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কার্যক্রম সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে'

গত ২ থেকে ৬ এপ্রিল গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদরি ও গারো ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে শিখন-শেখানো সামগ্রী চূড়ান্তকরণ কর্মশালা। কর্মশালায় পাঁচটি ভাষায় শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের জন্য গঠিত লেখক প্যানেলের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ূন খালিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ আলমগীর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী। এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) ড. মোঃ আবদুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ।

কর্মশালার প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ূন খালিদ বলেন, সময়ের দিক থেকে দেশের বিভিন্ন নৃ-জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাদানের উদ্যোগ কিছুটা বিলম্ব হয়েছে, সেটা ঠিক, কিন্তু একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সকল নাগরিকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এনসিটিবি'র এই শিখন-শেখানো উপকরণ প্রণয়ন রাষ্ট্রের এই অঙ্গীকার পূরণের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে।

বিশেষ অতিথি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ আলমগীর বলেন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষায় মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করেছে। এই কয়েক দিনের কর্মশালায় দেশের পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষায় শিখন-শেখানো সামগ্রী চূড়ান্ত করা হবে। আশা করি, আগামী ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসেই আমরা স্কুল পর্যায়ে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারব।

বিশেষ অতিথি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী বলেন, আমরা একটি ঐতিহাসিক দায় থেকে মুক্ত হতে চলেছি। প্রাথমিকভাবে আমরা পাঁচটি ভাষায় মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা পরিচালনা করব এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ভাষা এই শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় চলে আসবে।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক ও এমএলই ফোরামের সদস্য সচিব তপন কুমার দাশ বলেন, বাংলাদেশের যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে, আজকের উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। তিনি বাংলাদেশ সরকারকে এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ সংক্রান্ত কাজে কোনোরূপ সহায়তার প্রয়োজন হলে বিশেষ করে কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্রে এমএলই ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সদস্য সংগঠনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে এনসিটিবি'র সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) ড. মোঃ আবদুল মান্নান বলেন, কয়েক বছর ধরে এমএলই ফোরাম এনসিটিবি'র বিশেষজ্ঞগণ এবং বিভিন্ন ভাষার বিশেষজ্ঞগণ একসাথে কাজ করে চলেছেন। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মথুরা ত্রিপুরা

ত্রিপুরা নৃত্য

ত্রিপুরা জাতিসত্তার বৈসুক উৎসব

ত্রিপুরা জাতিসত্তার লোকসকল বাংলা বর্ষের শেষ দু'দিন ও নববর্ষের প্রথম দিন 'বৈসুক' উৎসব পালন করে। 'বৈসুক' উৎসবের প্রথম দিন ৩০ চৈত্র। এদিনকে বলে হারি বিসু। এদিন গৃহপালিত পশু-পাখিকে সকালে স্নান করিয়ে ফুলের মালা পরায়। বিকালে মন্দির, নদীর পাড়ে এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে প্রদীপ জ্বালায়।

'বৈসুক উৎসবের দ্বিতীয় দিন ৩১ চৈত্র। এদিনকে বলে বিসুমা। অনেকে মূল বৈসু বলে। বিসুমা দিনে 'কাচাই' পানি দিয়ে বাড়ি-ঘর পবিত্র করা হয়। এদিন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে পাঁচন,

পিঠা, মিষ্টান্নসহ নানান পদের মুখরোচক খাদ্য রান্না হয়। এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ঘুরে এসব খাবার খেয়ে প্রত্যেকে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। এ উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরা নারীরা ঐতিহ্যবাহী অপরূপ সাজে নিজেদের সাজিয়ে তোলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী নববর্ষের প্রথম দিনকে বলে 'বিসিকাতাল'। 'বিসিকাতাল' দিনে ত্রিপুরা জাতিসত্তার কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এমনকি নবদম্পতিরা নদী থেকে পানি এনে ফুল পানি দিয়ে প্রবীণ স্বজনদের স্নান করিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

ত্রিপুরা জাতিসত্তার 'বৈসুক' উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হলো গরয়া নৃত্য। 'গরয়া নৃত্য' একটি ঐতিয্যবাহী লোকনৃত্য। নতুন বছরে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য হারি বিসুর দিন গরয়া নৃত্যের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা জাতিসত্তার লোকেরা শিবকে বলে গরয়া। এই নৃত্যে শিবের প্রতীক হিসেবে ত্রিশূল ব্যবহার করা হয়। হারি বিসুর দিন আচাই অর্থাৎ পুরোহিত কোনো একটি বাড়িতে গরয়া দেবতার পূজা করেন। ঐদিন মধ্যরাতে ঐ বাড়ি থেকেই গরয়া নৃত্য-গীতের সূচনা হয়। গরয়া নৃত্য-গীতের শিল্পীদলের প্রধান হচ্ছেন আচাই। ত্রিশূলটি তাঁরই হাতে থাকে। এই গরয়া নৃত্য-গীতের পুরুষ শিল্পীরা ধুতি, জামা, কোমরবন্ধনী পরে। এছাড়া হাতে একটি গামছা থাকে। নারী শিল্পীরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে। আচাইকে ঘিরে শিল্পীরা ডান থেকে বাম দিকে ঘুরে ঘুরে ঢোলের তালে তালে এই নৃত্য-গীত পরিবেশন করে। নৃত্য-গীত শেষে আচাই ত্রিশূলটি মাটিতে পুঁতে দেয়। ঐ বাড়ির লোকেরা পরিবারের সদস্যদের মঙ্গলার্থে সামর্থ্যানুযায়ী মুরগি, চাউল, মদ, টাকা গরয়া দেবতার নামে আচাইয়ের হাতে তুলে দেয়। নির্দিষ্ট দিন শেষে গরয়া শিল্পীরা যে বাড়ি থেকে অনুষ্ঠান শুরু করেছিল, সেই বাড়িতে এসেই শেষ করে।

কুমার প্রীতীশ বল

বম ভাষা : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

জাতিবৈচিত্র্যের এক সমৃদ্ধ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম। এর ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এখানকার মানুষের আবাসস্থলের প্রকৃতি, ভাষা -সংস্কৃতি দেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে একেবারেই ভিন্ন। এখানে ১০ ভাষাভাষী ১১টি আদিবাসীর বসবাস রয়েছে। প্রত্যেক আদিবাসীরই নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা রয়েছে। এক পাহাড়ের কয়েক বর্গ কিলোমিটার জায়গায় এত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী জনমানুষের পাশাপাশি বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। এদের মধ্যে বম আদিবাসী জনগোষ্ঠী একটি। বমদেরও স্বতন্ত্র ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি রয়েছে। তারা কুকি-চিন বা সাইনো-টিবেটান ভাষাগোষ্ঠীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর জো জাতির একটি অংশ। এ ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বিভিন্ন পরিচয়ে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে, মিয়ানমারের চিন রাজ্য ও আরাকান, ভারতের মিজোরাম (লুসাই হিল), নাগাল্যান্ড, মন্দিপুর, আসামে বসবাস করে। পাকসিম বিত্বং বম জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এক গবেষণায় বলেছেন, Among the ethnic groups of people who are linguistically described as kuki chin, the tidim called themselves Zomi, the Kamplet and Mandates called themselves cho, the Lakher called themselves Laizo, the Lusai called themselves Mizo, the Zahaus too are probably zo, the Bawms called themselves Bawom-Zo and Pankhua called themeselves zo.

Dr. Vumson Zvi তার গবেষণা সমৃদ্ধ Zo History -তে খুমী, ম্রো ও খিয়াংদেরও জো ভাষা পরিবারের সদস্য বলে দাবি করেছেন। তবে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ভাষাগোষ্ঠীর বমরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম।

খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের পূর্বে বম, পাংখুয়া, লুসাই, তথা মিজো/জৌ ভাষার কোনো বর্ণমালা ছিল না। তারা সাধারণত মৌখিক ভাষার মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় তাদের অলিখিত সাহিত্য, লোকগীতি, গল্প, পৌরাণিক কাহিনী ও ধাঁধাগুলো ধরে রাখত। এখনো অনেক আদিবাসীর ভাষার লিখিত রূপ নেই।

Rev. J. Lorrain Ges এবং Rev F. W. Savidge খ্রিস্টান মিশনারীদ্বয় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে রোমান বর্ণমালা অনুসরণে বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। তা দিয়ে বাইবেলের অংশ, ধর্মীয় শিক্ষার পুস্তিকা, অভিধান ইত্যাদি বের করেন। মিজোরাম থেকে আগত লুসাই ধর্ম প্রচারকগণ এই বর্ণমালা বম-পাংখুয়াদের মধ্যে প্রচলন করেন। এই একই বর্ণমালা বম-পাংখুয়ারা ব্যবহার করে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়গুলোতে যখন বম-পাংখুয়ারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেন তখন থেকে এই বর্ণমালার ব্যবহার শুরু হয়। প্রথমাবস্থায় লুসাই ভাষার বাইবেল, ধর্মীয় সংগীত ব্যবহৃত হতো।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বমদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পরবর্তী সময়ে প্রচারকগণ বমদের এই বর্ণমালায় পাঠদান করতে থাকেন, ছোট হরফ আর বড় হরফ এবং শব্দ পঠনের দু'একটি নমুনা সম্বলিত এক পৃষ্ঠার কাগজে তারা পাঠদান করতে থাকেন। বাংলাদেশে দশ বারো হাজার বম জনমানুষের লিখিতরূপে ভাষার ব্যবহার এবং তার চর্চার ইতিহাস কিন্তু খুব দীর্ঘ নয়। তবে বম ভাষার জনমানুষের জন্য ভালো দিক হলো মিজোরামের মিজো ভাষার বই বমরা পেতে পারে সহজে, বমরা যে ভাষার ৭০/৮০ শতাংশ বুঝতে পারে। আসলে এই মিজো ভাষা বর্তমানে বমদের lingua franca। মিজোরামের গান খুবই জনপ্রিয়, মিজোরামের গান বাংলাদেশের বমদের মুখে মুখে। এই মিজো ভাষা বাংলাদেশের বম, পাংখুয়া ও লুসাই সবাই কমবেশি বোঝে। মিজোরামে এই মিজো ভাষায় পড়ানো হয় উচ্চশিক্ষা স্তরে।

সেই ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মিশনারীদের প্রবর্তন করা রোমান লিপি বমদের কাছে পৌঁছায় সম্ভবত ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী কালে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে দু'জন বম মিজোরামের সিরতে নামক গ্রামে লেখাপড়া শিখতে যান। জানামতে এই দু'জন- (Kualthang এবং Ngun Khar) বমদের মধ্যে প্রথম বর্ণমালা a, aw b জানা লোক।

এরপর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে রোয়াংছড়ি উপজেলার পানখ্যাং গ্রামে স্কুল খোলা হয়। এটিই বম গ্রামের প্রথম স্কুল। এই স্কুলে পাঠ্যবই হিসাবে মিজোরাম থেকে আনা মিজো/লুসাই ভাষার পাঠ্যবই ব্যবহৃত হয়। বইয়ের আকারে বম বর্ণমালা শিক্ষার বই 'বম বু বুল বু (Bawim Bu Bul Bu) বেরিয়েছে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। তার আগেই ১৯৪৮ সালে সামাজিক আচার-আচরণ, বিচার, শালিস ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বম সম্প্রদায় প্রথমই awm Dan Bu (Bawm Customary Law) নামে একখানি পুস্তিকা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে।

বম ভাষায় পবিত্র বাইবেল অনুদিত হয়েছে। বম ভাষা ভোট-বর্মি শাখার (Tibeo-Burman) কুকি-চীন দলভুক্ত ভাষা। বম ভাষায় ২৫টি বর্ণমালা আছে। তার মধ্যে ৫টি স্বরবর্ণ (vowels) আর ২০টি ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonants)। লক্ষণীয় যে, এই ২৫টি বর্ণমালার মধ্যে 'ল' এর কোনো ব্যবহার নেই। আবার ইংরেজির/রোমান হরফের q, x ও y বম বর্ণমালায় নেই। বম বর্ণমালায় ৩টি সংযুক্ত বর্ণ আছে- মধ্য : aw(অ), ch(চ) ও ng (ঙ)। বম ভাষায় Cluster of consonants-এর ব্যবহার আছে।

জির কুং সাহু

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা

মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করলে একজন শিশু আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তার মেধার দ্রুত বিকাশ হয়। অন্যদিকে ভিন্ন ভাষায় পড়ালেখা করলে তার মধ্যে মানসিক চাপ ও অসহায়ত্ব তৈরি হয়। আদিবাসী বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই ভাষাগত কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। তারা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কথা বুঝতে পারে না। পাঠ্যবইও পড়তে ও বুঝতে পারে না। ফলে শিশুরা অনেক সমস্যায় পড়ে ও ক্রমান্বয়ে ঝরে পড়ে। তাই এই শিশুদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে তিনটি ভাষা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। এগুলো হলো- চাকমা, ত্রিপুরা ও মার্মা। ইতোমধ্যে এ ভাষায় বর্ণমালা চার্ট, শব্দ গঠনের জন্য চক্রচার্ট, ফ্ল্যাশ কার্ড ও অনুশীলন খাতা তৈরি হয়েছে। আদিবাসী শিশুরা এর মাধ্যমে নিজ নিজ বর্ণমালা শিখছে। উল্লেখ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শেয়ার কর্মসূচির অধীনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইউনিক-২ প্রকল্প রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার মোট ১৪টি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মোট ২৬৪ জন আদিবাসী শিক্ষার্থীর মাঝে ১৪৩ জন মেয়ে ও ১২১ জন ছেলে।

২০১৫ সালের আগস্ট মাসে এই প্রকল্পের উদ্যোগে মাতৃভাষায় শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। তিনটি প্রধান আদিবাসী ভাষা- চাকমা, মার্মা ও ত্রিপুরা ভাষায় বর্ণমালা চার্ট ও চক্র চার্ট তৈরি হয়েছে। এছাড়াও আদিবাসীদের নিজস্ব রূপকথাকে বাংলায় অভিযোজন করা হয়েছে এবং সেগুলো সম্পূরক উপকরণ হিসেবে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় পঠনপাঠনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে।

এছাড়াও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশু শিক্ষার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আরো কিছু কাজ করছে। যেমন-(১) সংশ্লিষ্ট নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষক নিয়োগ (২) তার মাধ্যমে তাদের ভাষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম চালানো (৩) মূল পাঠ্যবই বাংলায় হলেও শিশুদের মাতৃভাষায় তা ব্যাখ্যা করা (৪) সহায়ক পাঠ উপকরণ তৈরি ও স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার এবং (৫) যে এলাকায় একই ভাষাভাষী শিশু বেশি সেখানে শিশু শিখন কেন্দ্র চালু করা। মাতৃভাষায় শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শেয়ার কর্মসূচির অধীনে ইউনিক-২ প্রকল্পের মাধ্যমে তার কর্মএলাকায় আরো কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো- কমিউনিটিকে সচেতন করা, সরকারি-বেসরকারি সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, ডকুমেন্টেশন ও প্রচার, আদিবাসী ও বাঙালি অধিবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি জোরদারকরণ।

এছাড়াও বর্তমানে আদিবাসী শিশুদের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। জানুয়ারি ২০১৭ সাল থেকে এ শিশুদের ভর্তি করা হবে এনএফপিই শিশু শিখন কেন্দ্রে। এর জন্য যেসব কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে তা হলো: শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিশু শিখন কেন্দ্রে আদিবাসীদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় রচিত এনসিটিবি-র পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা হবে; পর্যাপ্ত সরকারি বই না পেলে বেসরকারি সংস্থার বই ব্যবহার করা হবে এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিজস্ব উপকরণ ব্যবহার হবে। টিউটরদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে; বর্ণমালা কার্ড তিন ভাষায় (চাকমা, মার্মা ও ত্রিপুরা) প্রস্তুত করা হবে, শিশুদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় (চাকমা, মার্মা ও ত্রিপুরা) হাতের লেখা ভালোভাবে শেখার জন্য শিক্ষা খাতা তৈরি করা হবে এবং গান, ছড়ার বইসহ তিন ভাষার (চাকমা, মার্মা ও ত্রিপুরা) শব্দসম্ভার (Vocabulary) নির্বাচন করে বই প্রণয়ন করা হবে।

গোলাম ফারুক হামিম

আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা কর্মসুচি

কোডেক-এর মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা

শেয়ার শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সহযোগিতায় বেসরকারি সংস্থা কোডেক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মার্মা সম্প্রদায়ের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে এ কার্যক্রম বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার রূপসীপাড়া, গজালিয়া, ফাসিয়াখালী ও সদর ইউনিয়ন এবং নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ও বাইশারী ইউনিয়নের ৩০টি গ্রাম/পাড়ায় চালু হয়েছে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লামা ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার যে সকল পাড়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এবং অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানেও শিশুদের পড়ালেখার সুযোগ নেই, সে সকল গ্রাম জরিপ করে বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত গ্রাম থেকে শিখন এমএলই (মাল্টি লিংগুয়াল এডুকেশন) কেন্দ্রের জন্য ৫-৬ বছর বয়সী শিশু নির্বাচন করা হয়। শিশুদের পড়ানোর জন্য ঐ গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শিক্ষক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত পাড়ায় শিশুদের জন্য কমিউনিটি ও প্রকল্পের সহায়তায় যৌথভাবে শিখন কেন্দ্র তৈরি করা হয়।

শিখন কর্মসূচির আওতায় কোডেক ৪ বছর মেয়াদি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (প্রস্তুতিপর্ব থেকে পঞ্চম শ্রেণি), ৩ বছর মেয়াদি প্রারম্ভিক প্রাথমিক শিক্ষা (প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) এবং ১ বছর মেয়াদি শিখন ক্লাব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রারম্ভিক প্রাথমিক শিক্ষা মডেল-এর আওতায় বান্দরবান জেলার লামা ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে এমএলই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩০টি এমএলই কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৮৫ জন শিশু মাতৃভাষায় পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছে। এ বছর শেষে এ সকল শিশু নিকটবর্তী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে মূলধারায় ভর্তি হবে।

সেভ দ্য চিলড্রেন কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি, প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য মার্মা ভাষায় পাঠ্যবই, শিক্ষা উপকরণ ও সহশিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়। পাঠ্যবই উন্নয়নে এনসিটিবি'র বই অনুসরণ করা হয়। শিখন এমএলই কেন্দ্রের শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণি শেষ করে বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ালেখা করছে। শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণিতে সম্পূর্ণ মাতৃভাষায় (মার্মা) পড়ালেখা করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিশুরা এনসিটিবি'র বই-এর পাশাপাশি 'আমার মার্মা বই' নামে মার্মা ভাষার বই ব্যবহার করছে। দৈনিক পাঠদানে শিক্ষকদের সহায়তার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সহায়িকা তৈরি করেছে। শিক্ষকরা এ সহায়িকা অনুসরণ করে পাঠদান করেন।

এলএলই কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা ও পাঠদানের জন্য ৬ জন কর্মী ও ৩০ জন শিক্ষককে প্রথম পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি উপযোগী ১২ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বছরের মাঝামাঝি সময়ে আবার ৪ দিনের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মসূচির দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণির শুরুতে ৬ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ ও বছরের মাঝামাঝি সময়ে ৪ দিনের রিফ্রেশার্স কোর্স প্রদান করা হয়। কর্মসূচির তৃতীয় বছরে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণির শুরুতে ৬ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। চলতি বছরে ৪ দিনের আরও একটি রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা আছে। ২০১৪ সাল থেকে প্রতি মাসে ১ দিনের জন্য মাসিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (মাসিক রিফ্রেশার্স) পরিচালনা করা হয়। বান্দরবান জেলার এমএলই কার্যক্রম বিশেষজ্ঞ ও সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সহায়তায় এ প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালিত হয়। বর্তমানে শিখন এমএলই কেন্দ্রের শিশুরা মার্মা ভাষায় (২য় শ্রেণির উপযোগী) বই পড়তে ও লিখতে পারে। তাদের এই ভাষা শিক্ষা সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে বলে অভিভাবকরা মনে করেন।

রতন চক্রবর্তী

বীরত্বগাথা

হাজং ভাষা

মুক্তিযোদ্ধা শুহীদ সুধীর হাজং

১৯৭১ সালনি ল্য শুহীদলী রক্ত দিয়াঁহে আমরী আমলা মাওভূমিগে পাসে। ই-স্বাধীনতা আন্দোলনলা মুক্তি যুদ্ধাগিলী আমলা অহংকার। ৭১ সাল-লা ই-মুক্তিযুদ্ধনিকে বাখার হাজং আদিবাসী ছাওআ অংশগ্রহণ কুরিছে। সুসং দুর্গাপুরলী বগাউড়া গাঁওলা সুধীর হাজং উমাগিলীনি একজন সাহসী মুক্তিযুদ্ধা। উলা বাপ-প্রকাশ হাজং একজন সাধারণ হালী থাকিবীন। মাওরা ভাগিরথী ঘরতে কাম কুরিবীন। অয় শোষণ ও বৈষুম্যহীন সুখী সুন্দুর বাংলাদেশ লা স্বপ্ন দিখিবীন। উদী বেদেন অয় সংগ্রাম লা শুরু থকন ২৪ বছর বয়সনি মুক্তি যুদ্ধনি যাছে। উলা তাংকী সাহস থাকিবীন। কতর্ব্য কর্মনি অয় অবহেলা না কুরিবীন। উদিই উগে হুবীই বাখনাবীন। ভুটাননি গিরিলা যুদ্ধলা ট্রেনিং শেষকে ১১নং সেক্টর ১নং ক্যাম্পনি যুগ দেয়। উলা ক্যাম্প কুমান্ডার থাকিবীন আলতাব আলী চুন্নু।

১৯৭১ সালনা ১৬ নভেম্বর টাংহাটিনি পাকহানাদার লগন এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। পাছে পাকহানাদারগিলী পালী যায়। যুদ্ধ শেষকে ফিরী পথনি শুক্র পলা মাইন বিস্ফোরননি অয় শুহীদ হয়। সুধীর হাজংলা আত্মদান অনর্থ নি-হয়। শুহীদ লী রক্ত দিয়ে ভূই ভিজিয়ী যাচ্ছে বেদেন আমরী পরাধীন থকন মুক্ত পাসে। উলা ই-আত্মদান আমরী ইলাও মন্ত কুইরী উগে শ্রদ্ধা করে। অয় আমলা গর্ব ও অহংকার। অয় আমলা মাঝনি নাই, কিন্তু আমরী উলা স্বপ্নরা বুইয়া বিড়ায়।

স্বপন হাজং

বাংলা অনুবাদ

মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সুধীর হাজং

১৯৭১ সালে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন মাতৃভূমি পেয়েছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সোনার সন্তান ও আমাদের অহঙ্কার। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনেক হাজং আদিবাসী অংশগ্রহণ করে। সুসং দুর্গাপুরের বগাউড়া গ্রামের সুধীর হাজং তাদের মধ্যে একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর বাবা প্রকাশ হাজং একজন সাধারণ কৃষক, মাতা ভাগিরথী হাজং একজন গৃহিণী। সুধীর হাজং শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ২৪ বছর বয়সে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অদম্য সাহসী হিসেবে তার খুব খ্যাতি ছিল। ভুটানে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১১ নম্বর সেক্টরের ১ নম্বর কোম্পানিতে তিনি যোগ দেন। তাঁর কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন আলতাফ আলী চুন্নু।

১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বর টাংহাটিতে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে দাবরাম ক্যাম্পে ফেরার পথে শত্রু পক্ষের মাইন বিস্ফোরণে সুধীর হাজং শহীদ হন। সুধীর হাজংয়ের আত্মদান বৃথা যায়নি। তাঁর রক্তে সিক্ত মাটি বিজয় অর্জন করে মুক্ত হয়। তাঁর এই আত্মদান আমরা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি আমাদের গর্ব এবং অহঙ্কার। সুধীর হাজং আমাদের মাঝে আর নেই। কিন্তু আমরা তাঁর স্বপ্ন লালন করে গৌরব বোধ করি।

অনুবাদ : হাজং হরিদাস রায়

'এমএলই ফোরাম'-এর ৩৭তম সভা অনুষ্ঠিত

৬ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ বিকাল ৩.৩০ মিনিটে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে 'এমএলই ফোরাম'-এর ৩৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ম. হাবিবুর রহমান, পরিচালক, শিক্ষা সেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন।

তপন কুমার দাশ, এই সভায় এমএলই কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৬ এর মধ্যে এমএলই উপকরণ চূড়ান্তকরণ বিষয়ে দুটো কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ কর্মশালার উদ্বোধনী দিনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আলমগীর উপস্থিত ছিলেন। জনাব খালিদ আগামী ২০১৭ সালে জানুয়ারি মাসের মধ্যে আদিবাসী শিশুদের হাতে এমএলই উপকরণ তুলে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে আলবার্ট মানকিন বলেন, উপকরণ মুদ্রণ সম্পন্ন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তিনি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ যথাসময়ে সম্পন্ন করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ যথাসময়ে সম্পন্ন করা না গেলে যথাসময়ে শিশুদের হাতে উপকরণ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

জনাব বাঁধন আরেং এ প্রসঙ্গে বলেন, বিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের এবং শিক্ষকদের এমএলই বাস্তবায়ন কৌশলসহ সার্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দরকার।

মুরশীদ আক্তার বলেন, প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া জরুরি। বর্তমানে যে শিক্ষক সহায়িকা আছে তা পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষক সহায়িকাকে MLE বিষয়ের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী করতে হবে। আর সবশেষে শিক্ষকরা এমএলই বিষয়ে কোন আঙ্গিকে কীভাবে পড়াবে সে বিষয়ে ধারণা দিতে হবে। এমএলই উপকরণ মুদ্রণ এবং বিতরণের আগে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা জরুরি।

এ প্রসঙ্গে ডা. গোলাম মোস্তফা বলেন, যেসব শিক্ষক আদিবাসী শিশুদের পড়াবেন, তাদের অধিকাংশই ঐ ভাষা লিখতে পড়তে পারে না। সে কারণে শিক্ষক সহায়িকা বাদ দিয়ে প্রি-প্রাইমারি বাস্তবায়নে যাওয়া ঠিক হবে না। ৫টি ভাষার জন্য ৫টি শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করতে হবে। এমএলই উপকরণ বিতরণের আগে স্থানভিত্তিক জরিপ করা জরুরি। কোন কোন এলাকায় কতজন শিক্ষার্থী আছে তা নির্ধারণ করা দরকার। এটা করতে পারলে কত সংখ্যক বই ছাপা হবে তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। সে কারণে বই প্রিন্ট করার আগে প্রয়োজন জরিপ করা।

ম. হাবিবুর রহমান বলেন, এমএলই ভিত্তিক শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠান জড়িত আছে কিনা জানা নেই। এমএলই উপকরণ মুদ্রণ ও বিতরণের আগে তিনি কিছু বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন :

১. জরিপ যারা করছে তাদের সঙ্গে এমএলই ফোরামের সমন্বয় হওয়া জরুরি
২. অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬-এর পূর্বে এমএলই বিষয়ে কাজের সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া
৩. এমএলই বিষয়ে জরিপ করা
৪. প্রশিক্ষণ উপকরণ হালনাগাদ করা
৫. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান ।

বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় :

- এমএলই ফোরামে কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ডিপিই, এনসিটিবি এবং ইউনিসেফ সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত কর্মকর্তাকে এমএলই ফোরামের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো।
- এমএলই বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে যারা জরিপ করছে তাদের সঙ্গে এমএলই ফোরামের সমন্বয় করা এবং জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ছক দিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সহযোগিতা করা।
- শিক্ষা আইন-২০১৬ (খসড়া) এর উপর মতামত ৭ এপ্রিল ২০১৬ এর মধ্যে দিতে হবে। এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটিতে থাকবেন : মুরশীদ আক্তার-প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, মেহেরুন্নাহার স্বপ্না-সেভ দ্য চিলড্রেন, তপন কুমার আচার্য-ব্র্যাক এবং মো. শাহ্ আলম-গণসাক্ষরতা অভিযান, কারিগরি কমিটি সভার তারিখ ঠিক করে আলোচনায় বসবে।
- এমএলই ফোরামের সভা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সংস্থায় অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে প্ল্যান বাংলাদেশ কার্যালয়ে।

মো. শাহ্ আলম

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি, ১১ মে, বুধবার ভোর ৪টায় মুম্বাইয়ের হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। গত ২৮ এপ্রিল সকাল ৮টায় মুম্বাইয়ের হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

এডভোকেট প্রমোদ মানকিন ১৯৩৯ সালের ১৮ এপ্রিল নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বাকালজোড়া ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে এক গারো পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মেঘা তজু এবং মায়ের নাম হৃদয় শিসিলিয়া মানকিন। তিনি আট ভাই-বোনের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন।

প্রমোদ মানকিন ১৯৬৩ সালে নটরডেম কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড এবং ময়মনসিংহ 'ল' কলেজ থেকে ১৯৮২ সালে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য ছিলেন।

ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। গারো এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি হিসেবে প্রমোদ মানকিন জাতীয়ভিত্তিক সামাজিক সংস্থা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি আমৃত্যু প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি মোট চার বার (১৯৯১, ২০০১, ২০০৮ এবং ২০১৪ সাল) জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ভারতের মেঘালয় শিববাড়ি উদ্বাস্তু শিবিরে পরম আন্তরিকতার সাথে পঞ্চাশ হাজার শরণার্থীর দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন।

একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা প্রমোদ মানকিন কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি আইন পেশা ও এনজিও কার্যক্রমে যুক্ত হন।

তিনি ১৯৬৪ সালের ২৯ জানুয়ারি নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিশিষ্ট গারো নেতা ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জোয়াকিম আশাক্রা-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা মমতা আরেং-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি পাঁচ কন্যা ও এক পুত্রের জনক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

কুমার প্রীতীশ বল

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত **গণসাক্ষরতা অভিযান**-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় 'অঙ্গীকার' প্রকল্পের আওতায় **গণসাক্ষরতা অভিযান** কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯; ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-২; ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org